PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine due to prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

অষ্টম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ / 24.11.2020

-: সম্পাদক:-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জ্ঞানের মূলতত্ত্ব	শ্রী প্রিয়দারঞ্জন রায়
গোরখনাথের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
দুই রূপে তুমি বর্ষা	শ্রী অক্ষয় মুখার্জী
যদি তুমি চাও	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
আবার কুরুক্ষেত্র	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

আমাদের ব্যক্তিগত আরাম, পরিতৃপ্তি, ভোগ অথবা আনন্দ অনুসন্ধানের সকল প্রয়াস ত্যাগ করতে হবে। জীবনে পরমকে পাবার জন্য এক জ্বলন্ত শিখা হয়ে যাও। যা কিছু তোমার জীবনে ঘটছে তা সবই তোমার উন্নতির সহায়ক রূপে মেনে নাও এবং তোমার জীবনের উন্নতি সাধনের চেষ্টা কর।

যে কাজই তুমি করছো, তা সব আনন্দের সাথে কর। কিন্তু সুখের প্রলোভনে কোন কাজ কোরো না। কখনও উত্তেজিত হয়ো না, হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ কোরো না বা বিক্ষুব্ধ হয়ো না। যা কিছু ঘটুক না কেন সর্বতোভাবে শান্ত ও স্থির হয়ে থেকো। সর্বদা সচেতন হয়ে থাকতে হবে যে-উন্নতি তোমায় করতে হবে সে-সম্বন্ধে, এবং কালক্ষেপ না করে সেই উন্নতি করতে হবে। বাইরের জগতে যা ঘটছে, বাহির দেখেই তা বিচার করা ঠিক নয়। তারা হলো অন্য একটা কিছু প্রকাশের অনিপুণ প্রয়াস মাত্র। তারা প্রকাশ করতে চায় একটি সত্য বস্তু যা তোমার বাহ্যিক বোধশক্তি ধরতে পারছে না। কারো ব্যবহারে কোন দিন বিক্ষোভ প্রকাশ কোরো না। তাদের প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু আছে যা তাকে এমন সব কাজ করাচ্ছে।

তোমার সাধ্য ও সাধনা দিয়ে তাদের পরিবর্তিত করতে হবে। অযথা ভগবানের কাছে নালিশ-অভিযোগ করায় কোন ফল হয় না। এতে ভিতরে ক্ষোভ ও ব্যথা বাড়ে। যাই কর না কেন, কখনও ভুলবে না তোমার লক্ষ্য কি – যা তুমি তোমার জীবনে গ্রহণ করেছ। ..... **

** শ্রী প্রীতিকুমার কর্তৃক ০৬/১১/১৯৮১ তারিখে শ্রীমতী রেখা শিকদারকে পশ্চিম জার্মানীতে লেখা পত্র থেকে সঙ্কলিত।

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রী প্রীতিকুমারের লেখা চিঠিগুলির মধ্যে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনেকের নাম আছে। কোনও কোনও ঘটনার উল্লেখ নিতান্তই অতীতকালের। আজ আর মনে করা সম্ভব নয় ঠিক কি মনে করে বা কোন পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। চিঠিগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি – শ্রদ্ধা- ভালবাসা, রাগ, অভিমান, শিক্ষা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে এ চিঠিগুলিতে। এই চিঠিগুলি তাঁকে বুঝতে আমাদের হয়ত অনেক সাহায্য করবে।

০৯/০৩/৫৯

সাথী,

সমস্ত বিরোধকে ভুলে যাও, মন ও প্রাণকে শান্ত করে পড়াশুনায় মন দাও। ..... নিজের কাজ নিয়ে নিজে থাক। কোথাও যাবার দরকার নেই। আমার এখানে এসে উঠো। যাহোক করে ব্যবস্থা করে নেব। কোনও ভাবনা করবার দরকার নেই। মনকে অন্তর্মুখী কর। জীবনকে শান্ত ও সুন্দর করে তোল। সত্যকে জীবনে উপলব্ধি কর। সংসারে শুধু শুনে যেতে হয়, দেখে যেতে হয়। যে রাগে ও অধৈর্য হয় সে নিজেকে নিজেই ধ্বংস করে।

আমার কথা শুনে চলো, তাতে শান্তি পাবে। এতবড় বন্ধু তোমার আর কেউ নেই। নিজের অহং ও স্বার্থ দুটিকেই ছাড়তে হবে, তবেই না পাব আমরা পরম আনন্দ ও সুখ। নিজে যা বোঝ সেটি ঠিক এই ভাবকে দূর কর। জেদকে সংযত কর ...। শান্ত হয়ে যাও, নীরব হয়ে যাও। সত্যের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে আন। আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে চলার পথে পাথেয়। তাছাড়া আমি সদা সর্বদা রয়েছি তোমাতে। তাই বলি সব ভাবনা ও জীবন ছেড়ে দাও আমার হাতে। তুমি যন্ত্র হয়ে কাজ করে যাও। পাবে শান্তি ও সুখ। কারণ আমার সব কিছু তোমাদের।

শুভেচ্ছা নাও, প্রীতি নাও।

ইতি –

তোমার প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

১০.০৩.১৯৫৯

প্রিয় সাথী,

আজ আমার জন্মদিনে তোমায় আশীর্বাদ করি। যত সংগ্রামই তোমায় করতে হোক শেষ পর্যন্ত তোমার জয় সুনিশ্চিত। আর রইল শুভেচ্ছা ও প্রীতি, যাতে তোমার সকল কর্ম প্রেমময় ও পবিত্রময় হয়।

বাপীর জন্য রইল এই সত্য বাক্য যে ও জীবনে সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। উপলব্ধি করবে সত্যকে। আর সেই সত্যের আলো জগতকে দিয়ে যাবে।

– প্রীতিকুমার

পুঃ– তোমার জিনিষ পেয়েছি। ভানুকে কাপড় বাবদ পাঁচ টাকা গতকাল দিয়েছি। সামনের বার বাকী টাকা দেব। জিনিষপত্র হিসাব করে পাঠাবে। কোনও ভাবনা করবে না। মঞ্জু এসেছিল। কোনও কথা হয়নি। বেলা এসেছে। রেবা নাকি বলেছে শ্বেতা বেড়াতে এসেছিল। আর সব ব্যাপার চেপে গেছে। বাবু ও তুমি ভালবাসা নিও।

ইতি–
প্রীতিকুমার

৫এ, অক্ষয় বোস লেন,
কলিকাতা–৪
১২–০৩–৫৯

প্রিয় সাথী,

গ্রামসেবিকা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছ সেটাই ঠিক। B.D.O–র কথামত চলতে হবে এমন কথা নেই। তাছাড়া নিজের সংসারে বাইরের লোক থাকা ঠিক নয়। ... সমস্ত অবস্থায় সাহসে ভর করে সত্যের পথে চলবে। তোমার Department আলাদা। সাহস করে D.M.–কে Report করলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চাকরি করতে গেছ। সেখানে হরিছত্রের মেলা বা দানছত্র খুলে বসনি। চাকরী ক্ষেত্রে আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা করবার জন্য বাসা করা হয়না। ... B.D.O. গ্রামসেবিকাকে নিজের বাড়ীতে রেখে কৃপা করতে পারতেন। নিজে নিজের সত্য ও ন্যায়ের পথে চল। সামান্য চাকরী করতে গিয়ে ভয় করা ঠিক নয়। আমি যে কয় জায়গায় চাকরী করেছি সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি ও মারধোর করতে কুন্ঠিত হই নি। ফলে সাহেবরাও বদলী হতে বাধ্য হয়েছে। নিজের ভিতর সত্যের তপঃশক্তিকে জাগিয়ে রাখলে জীবনে সমস্ত অবস্থায় জয় সুনিশ্চিত।

জন্মদিনে তোমার ও বাবুর কথাই ভেবেছি। বাবু বড় মায়া লাগিয়ে দিয়েছে জীবনে। অনেক ক্ষেত্রে আজ দুর্বল হয়ে পড়েছি ঐ একটি জীবনের জন্য। ওর ঐ নিবিড় করে আমাকে আঁকড়ে ধরা, আমার সমস্ত শক্তিকে ও দুর্বল করে তুলেছে। মনে হয় আমকে ওপারের ডাকে হয়ত ও যেতে দেবে না। ওর সঙ্গ যেমন আমাকে আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনই ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে দুর্বল করে তোলে। তোমার আসনে বসে খেয়েছি ও রোজ খাচ্ছি। মন্টু তোমাকে "সাজেশন" পাঠিয়েছে, কিন্তু খামে Stamp দিতে ভুলে গেছে। পেয়েছ কিনা জানাবে।

দ্বিজেনবাবু বিশ্বনাথ বাবুর বইটার জন্য চিঠি দিয়েছে। তুমি সত্বর বইটা পড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। Eng. note আমি এবার ভানুর হাতে পাঠাব। আমি শনিবার বিশেষ কাজে খড়গপুর যাচ্ছি। কলকাতায় ফিরব মঙ্গলবার। ফিরে ২০/৩ তোমার ওখানে যাব।

যতটুকু সময় পাও মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। এখন সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনকে শান্ত কর। আমার চিঠি না পেলে ব্যস্ত হবে না। তবে রোজ চিঠি পাবে।

বাবুকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। তুমি আমার ভালবাসা নিও।

ইতি–
প্রীতিকুমার

2–30 P.M.

পুঃ– দোকানে এসে তোমার চিঠি পেলাম। মেঘনাদের বাবাকে যা বলবার আমি বলব। তুমি চুপচাপ থেকে কাজ করে যাও। আর বিস্তারিত পরে জানাব।

–প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

জ্ঞানের মূলতত্ত্ব

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন চোখ খুলে তাকায়, এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তখন অকস্মাৎ তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নিকটে ও দূরে তার চতুর্দ্দিকে সংখ্যাতীত বিচিত্র বিষয়বস্তু, জড় ও জীব, এবং ঊর্দ্ধে নীলাকাশে অগণিত জ্যোতিষ্করাজি দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়। সে আরও দেখে এসব পদার্থের কতকগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের স্থান পরিবর্তন করে, এগুলি কোথা থেকে এসেছে, কেনই বা এসেছে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। তার এই প্রথম জ্ঞানের অনুভূতি তার কোন স্বকৃত চেষ্টার ফল নয়। এটা প্রকৃতির অযাচিত দান- প্রত্যেক মানব শিশুর পৈত্রিক সম্মতি ও জীবনযাত্রার পথের সম্বল। একে বিজ্ঞানী বা দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান বলেন। কারণ তার দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগে এই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই সংযোগ গড়তে হলে আলোকের আবশ্যক; কারণ অন্ধকারে সে কিছুই দেখে না। বিষয়বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যখন তার চোখে পড়ে, সেখান থেকে তার সংঘাত বেদনা সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে পরিবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে উপনীত হয়। সেখানে এক অপূর্ব কৌশলে সুগঠিত ও সুসংহত হয়ে তা তার মানসপটে এসে বহির্জগতের বিষয়বস্তুর প্রতিবিম্বরূপে দেখা দেয়। বহির্জগতের বিষয়বস্তুর এই প্রতিবিম্ব তাদের যথাযথ বা অবিকল রূপ ও গঠন কিনা এটা কোন বিজ্ঞানী বলতে পারে না। এই জাগতিক দৃশ্য যে দেশ ও কালের পটভূমিতে সাজানো, এটাই তার (মানব শিশুর) অনুভূতি হয়। বহির্জগতের ঘটনাবলীর পরম্পরা থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতরূপে সে কালের ধারণা করে। অসম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানে তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চেষ্টা করে বহির্জগতের বিষয় ও ঘটনা সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানবার জন্য। এই থেকেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়বোধের পরস্পর অসংলগ্ন বিষয়বস্তু ও ঘটনা পরম্পরার জ্ঞানকে বুদ্ধি প্রয়োগে পরীক্ষা, প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে বিশ্লেষণপূর্বক বিজ্ঞান জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করেছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে লব্ধ বহির্জগতের বৈচিত্রের মধ্যে বিজ্ঞান করেছে ঐক্যের সন্ধান।

একথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিশক্তির একটি সীমা আছে। যা কিছু অতি ক্ষুদ্র বা অতি দূরে তা আমরা দেখতে পাই না, বা যা কিছু অতি বিশাল তা ধারণা করতে পারি না। দেশ কালের বিভিন্ন অবস্থায় দৃশ্যবস্তু আমাদের নিকট বিভিন্ন আকারে বা বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সময় বা সায়াহ্নে সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে আমরা একটি বড় রকমের রক্তাভ চাকতির মত দেখি, কিন্তু মধ্যাহ্নে সেই একই সূর্য ঊর্দ্ধাকাশে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অত্যুজ্জল সাদা চাকতির রূপ পরিগ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈলচিত্র বা আলোকচিত্রের কিংবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রের প্রতি তাকিয়ে আমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করে বিশেষ প্রশংসা করি; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধনকারী পুরু কাচের (lens) মধ্য দিয়ে তাদের দেখলে আমরা শুধু কতকগুলি বিভিন্ন রং এর এলোমেলো দাগ ভিন্ন আর কিছু দেখতে পাই না। আমাদের শুধু চোখে সূর্যকে চাকার মত দেখি, কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সূর্য হচ্ছে একটি অতিকায় দারুণ উত্তপ্ত ও প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন প্রভৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাথমিক জড় কণিকার বর্ত্তুলাকার প্লাসমা (plasma) পিণ্ড এবং তার চারিদিকে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পুরু এক জ্বলন্ত বাষ্পের বেষ্টনী। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ দীর্ঘ এবং পৃথিবী থেকে ৯.৩ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। এরূপ প্রকাণ্ড ও বিশাল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা হয় না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি মাত্র সাত রং এর আলো উপলব্ধি করতে পারে- লাল, কমলা, পীত, হরিৎ, নীল, ঘননীল ও বেগুণী। কিন্তু অন্যান্য বহু আলোকরশ্মি যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুণী আলোকরশ্মি থেকে কম- যথা বেগুণী পারের (ultra violet) আলোকরশ্মি, X রশ্মি, গামা রশ্মি এবং মহা জাগতিক (cosmic) রশ্মি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না; আবার যে সব আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘের চেয়ে কম যথা লালতর (infra-red) আলোকরশ্মি, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (electric waves) এবং রেডিও তরঙ্গ (radio waves) আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তির চোখে এ সকল আলোকরশ্মির উপলব্ধি বা অনুভূতি সম্ভব হত তাহলে আমাদের দৈনন্দিন বহির্জগতের অবয়ব ও রূপ তার নিকট যেত সম্পূর্ণ বদলে। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ বহির্জগৎ

DO NOT COPY

বা বিশ্বের অনুভূতি বা জ্ঞান বড়ই অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ এবং এমন কি ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়ে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের গতিপথ; কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত,- অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী আপন গতিপথে ঘূর্ণায়মান। ফলে, দেখতে পাই যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে লব্ধজ্ঞান বহির্জগতের স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু ও ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে না, কিংবা এ সবার অস্তিত্বের কারণ ও উৎপত্তির কোন ধারণা দিতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যা আমরা শুধু চোখে দেখি তা তাদের খাঁটি বা সত্যকার রূপ বা অবয়ব নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ তাই একটি খণ্ড বা আপেক্ষিক সত্য, মায়া বা ভেল্কিবাজী। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনেও বহির্জগতকে মায়া, আপাত বাস্তব বা আপেক্ষিক সত্য বলে অভিহিত করেছে।

বুদ্ধি ও যুক্তিবিচার প্রয়োগে মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তাকে বলা হয় বিজ্ঞানের পন্থা। এটি বিজ্ঞানীদের স্বকৃত প্রচেষ্টার ফল। বহির্জগতের জড় বস্তুকে তাঁরা বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন তাদের অন্তিম উপাদান রূপে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। বহির্জগতের যে শক্তি অহরহ ক্রিয়াশীল তাকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন তেজ বা আলোকরূপে, তাপরূপে, বিদ্যুতরূপে, চুম্বকরূপে ও যান্ত্রিকরূপে। বিজ্ঞানের মতে তাই জড় ও শক্তি মিলে গড়ে তুলেছে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পরস্পর রূপান্তর। শুধু তাই নয়, শক্তি এবং জড় কণিকার মধ্যেও করেছে এই রূপান্তরের আবিষ্কার। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, অবস্থা বিশেষে কণিকাধর্মী জড় পদার্থের তরঙ্গধর্মী শক্তিতে পরিণতি ঘটে; অপরপক্ষে, তরঙ্গধর্মী শক্তি জড় কণিকার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে। এই কণিকারূপী তেজ শক্তিকে ফোটন (photon) বলা হয়। জড় ও শক্তির এই বিনিময়ের ব্যাপারে দেখা গেছে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় কণিকা বা পরমাণু রূপান্তরিত হয়ে অপরিমিত শক্তির সৃষ্টি করতে পারে। এই বিনিময়ের সমীকরণ আবিষ্কার করেছেন বিশ্ববিশ্রুত আইনস্টাইন। এই সমীকরণ হচ্ছে E(শক্তি)$=mc^2$; m হচ্ছে জড় কণিকার ভর(mass); c=আলোকের গতিবেগ(velocity of light)। একথা অনেকে জানেন যে, প্রতি সেকেন্ডে আলোক তরঙ্গ ১,৮৬,৩২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায় অতিক্ষুদ্র জড় কণিকা ভেঙ্গে প্রভূত পরিমাণ শক্তির উৎপত্তি ঘটতে পারে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে পরমাণু বোমার আবিষ্কারে। আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞানকে ভিত্তি করে মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে অভাবনীয়রূপে। সে আবিষ্কার করেছে বিশ্বের বা বহির্জগতের এক নূতন রূপ। বিজ্ঞানের এই বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে যে অচল অটল হিমালয় পর্বত আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তে উহা হচ্ছে সংখ্যাতীত জড়াণু ও জড় পরমাণুর বিস্তৃতদেশ জুড়ে অহরহ ছুটোছুটি। এক টুকরো কঠিন প্রস্তর খণ্ডের বেলাও এ কথা খাটে। আমরা যা শুধু চোখে কঠিন পদার্থ বলি তা আসলে অসংখ্য রন্ধ্রপূর্ণ ও কোটী কোটী প্রচণ্ড বেগে চলন্ত জড় কণিকার আধার। সুতরাং আমাদের চোখের দেখার জগত আর বিজ্ঞানের জগতের মধ্যে দেখা যায় আকাশ পাতাল তফাৎ। অধিকন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তির ভেদাভেদ ঘুচে যাওয়ায় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে এই বিশ্বজগৎ হচ্ছে এক বিরাট মহাশক্তির ক্রীড়াভূমি- বিজ্ঞানের ভাষায় অসীম দেশকালব্যাপী এটি একটি তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্র (Electro-magnetic field)। এটা সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়াশক্তির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে মানুষের আপন বুদ্ধি প্রয়োগে উপার্জিত জ্ঞান বলা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈচিত্রের মধ্যে বিজ্ঞান এই ঐক্যের সন্ধান পেয়েছে। বিশ্বরহস্যের সমাধানের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার মূলে রয়েছে কার্যকারণ শৃঙ্খলার নিয়মের (law of causality) ধারণা। কিন্তু এই কার্যকারণের শৃঙ্খলার নিয়মের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান প্রথম বা আদি কারণের তথা অন্তিম পরিণামের কোন সন্ধান দিতে পারে না। বীজ থেকে গাছের উৎপত্তি হয়, গাছ থেকে পরিণামে বীজ হয়, একথা সকলেই জানে। কিন্তু গাছের কারণ বীজ, না বীজের কারন গাছ- বিজ্ঞানে বা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে এর কোন মীমাংসা হয় না। সুতরাং দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে মানুষ আপন চেষ্টায় যে জ্ঞানের আহরণ করে তাকেও সম্পূর্ণ ও নির্ভুল বলা যায় না।

DO NOT COPY

ফলে, বৈজ্ঞানিক সত্যও অপূর্ণ বা আপেক্ষিক। বিজ্ঞানকে তাই সাধারণতঃ বলা হয় সতত অপসৃয়মাণ অখণ্ড সত্য বা সামগ্রিক জ্ঞানের জন্য বিরাম বিহীন সাধনা বা সন্ধান। কেননা, বৈজ্ঞানিক সত্য পরিবর্তনশীল এবং সতত পরিশোধিত হচ্ছে। তাই মানতে হয় বিজ্ঞানের অনুশীলনে বা সাধনায় পূর্ণ সত্য বা সামগ্রিক জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। যেহেতু, মানুষের বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে, অসীমের ধারণা তার বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শরৎকালের রাত্রিতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত অবধি বিস্তৃত যে ছায়াপথ(galaxy) দেখি তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যন্ত্রযোগে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আমাদের সূর্য ও তার অনুরূপ দশহাজার কোটী (10^{10}) নক্ষত্র বিরাজিত আছে। এ প্রকার কোটী কোটী ছায়াপথ রয়েছে অসীম আকাশ জুড়ে। এইসব নক্ষত্রের পরস্পর মধ্যবর্তী প্রদেশে আবার ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নীহারিকা বা নক্ষত্র সৃষ্টির মাল মশলা। আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্রই যা শুধু চোখে আমরা দেখি এক একটি আকারে সূর্যের সমান বা তা থেকেও বড়। এ থেকেই সহজে বোঝা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড এবং তার ধারণা করতে গেলে মানুষের বুদ্ধি বিচার বা জ্ঞান কোন কূল কিনারা পায় না। এ প্রসঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কথায় বলা যায় যে নুনের পুতুল গিয়েছিল সাগর মাপতে, সাগরে নামামাত্রই সে সাগরজলে গুলিয়ে একাকার হয়ে গেল। অসীমের ধারণা করতে গেলে বিজ্ঞানীদের ও অনুরূপ অবস্থা ঘটে।

বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াসের ফলে বিজ্ঞানীরা এখন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাদের বহির্জগত একটি সর্বব্যাপী বিদ্যুতচুম্বক শক্তির ক্ষেত্র (Electro-magnetic field) থেকে উদ্ভুত হয়েছে; সাধারণের ভাষায় এই ক্ষেত্রকে মহাকাশ বা শূন্যাকাশ(space)বলা হয়। এই তড়িৎক্ষেত্র বা মহাকাশের(space) প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা নির্দ্দেশ করেন একমাত্র গণিতাঙ্কের সমীকরণে কতকগুলি সাঙ্কেতিক ধ্রুবকের (constants) সাহায্যে- যথা, C=আলোকের গতির ধ্রুবক, g=মহাকর্ষের ধ্রুবক, h=প্লাঙ্কের ধ্রুবক ইত্যাদি।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত আলোকরশ্মি অবস্থা বিশেষে তরঙ্গধর্ম্মী এবং জড়কণিকা রূপে চলাচল করতে পারে। আলোকশক্তি যখন তরঙ্গরূপে চলাচল করে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে কিসের তরঙ্গ? এর উত্তরে এক সময়ে বিজ্ঞানীরা বস্তুভরহীন, সর্বব্যাপী কিম্ভুতকিমাকার ঈথার (Ether) নামক পদার্থের অস্তিত্বের ধারণা করেছিলেন। বর্ত্তমানে এই ঈথার (Ether) পদার্থটিকে মহাকাশ(space) বা তড়িৎ চুম্বকক্ষেত্র রূপে পরিগণিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান এখানে দর্শনের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের বিশ্বচিত্র এখন একপ্রকার শূন্যে মিলিয়ে গেছে। বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যের প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের এই শক্তিক্ষেত্রের তুলনা করা চলে।

সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনে মহাশূন্যকে(space)বলা হয়েছে আকাশ। এই আকাশের দুই প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে- (১)কারণাকাশ বা পুরাণাং খম্(non-atomic), (২) কার্য্যাকাশ বা বায়ুরং খম্,(Atomic)। কারণাকাশ হচ্ছে সর্বব্যাপী, গতিহীন, সর্বত্রধর্মী, সর্বগম্য শক্তি = তরঙ্গের ক্ষেত্র বা বাহক। এই কারণাকাশকে বিজ্ঞানীদের ঈথারের(Ether)সঙ্গে তুলনা করা যায়; একেই মহাশূন্য বা মহাকাশ অর্থাৎ অবকাশ(space)বলা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের তড়িৎ চুম্বকক্ষেত্রের ধারণার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। অপরপক্ষে, কারণাকাশ থেকে উদ্ভুত কার্য্যাকাশ হচ্ছে প্রাথমিক জড় কণিকার সূক্ষ্মাবয়ব(আকাশ তন্মাত্র)। এই আকাশ তন্মাত্র পরস্পর জড়ীভূত হয়ে অন্যান্য প্রাথমিক সূক্ষ্ম জড়কণিকার তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত)সৃষ্টি করে। শক্তি ক্ষেত্র বা মহাশূন্য থেকে সূক্ষ্ম জড়কণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এই মতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানী হয়েলের (Hoyle) প্রবর্তিত আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ববাদের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়।

আমরা এখন দেখতে পাই যে আমাদের বিশ্ব বা বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দুটি প্রশস্ত পথ আছেঃ ১) আমাদের ইন্দ্রিয় বোধ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ২) আমাদের বিচার বুদ্ধি ও বুদ্ধিকৌশল। প্রথম পথে আমরা জন্ম থেকেই দেশকালের পটভূমিতে বহির্জগতের বৈচিত্রের (বিচিত্র বস্তু ও ঘটনা পরম্পরা) অভিজ্ঞতা লাভ করি আমাদের স্বকৃত কোন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে। এটা আমাদের

DO NOT COPY

জন্মগত অধিকার। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের সংস্পর্শে এলেই এই জ্ঞানের উৎপত্তি। যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ জ্ঞানের এই বিশ্বচিত্র বুদ্ধিবিচার প্রয়োগে বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ, বিধিবব্ধ ও সমষ্টিবদ্ধ করবার চেষ্টা করি তখন আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হই। এটা হলো বিজ্ঞান বা বুদ্ধির পথ। এই বুদ্ধিবিচার প্রয়োগের মূলে রয়েছে একটি সার্বজনীন বিশ্বাস- প্রকৃতির রাজ্য হচ্ছে একটি নিয়মের রাজ্য। এই নিয়মের গোড়ায় রয়েছে কার্যকারণ তত্ব(law of causality) এবং প্রাকৃতিক ঐক্যানুবর্তিতা(law of uniformity of nature)-ঋত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের বিশ্বচিত্র হচ্ছে অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক এবং ভ্রমাত্মক। এটাও দেখা গেছে যে, বুদ্ধিবিচার প্রয়োগে লব্ধ বিজ্ঞানের বিশ্বচিত্রের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ দৈনন্দিন বিশ্বজগতের কোন সাদৃশ্য নাই এবং বিজ্ঞানের এই বিশ্বচিত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ আমাদের চর্ম চোখে দেখা যায় না, এমনকি মানসচোখের অগোচর। যদিও আমাদের বুদ্ধিনির্মানের এই বৈজ্ঞানিক জগৎচিত্র গড়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়বোধের জগতকে ভিত্তি করে, তথাপি পরিণামে এটা কেবলমাত্র গণিতবিদ্যার একটি সমস্যাপূরণরূপে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের জগতের মত বিজ্ঞানের এই অতীন্দ্রিয় জগতচিত্রও পূর্ণ বা নিরপেক্ষ নয়। বাস্তবের (Absolute Reality) বা সামগ্রিক জ্ঞানের (Perfect knowledge) বা অখণ্ড সত্যের(Absolute Truth) স্বরূপ নির্ণয় এর সাধ্যায়ত্ত নয়। কেননা, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা তত্বের আদি শৃঙ্খলের কোন নির্দেশ এটি দিতে পারে না, অথবা প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম রক্ষার কর্ত্তাই বা কে, এরও কোন উত্তর দিতে পারে না। অতএব দেখা যায় যে, বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগলব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আপেক্ষিক, অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিময়। ইহার কারণ ইন্দ্রিয়বোধের মত আমাদের বিচার বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে। দেশ ও কালের পরপারে অসীমের রাজ্যে প্রবেশ এর সাধ্যায়ত্ত নয়, ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানে শক্তির প্রকারভেদের আলোচনায় অথবা সামগ্রিক জ্ঞান কিংবা বিশ্বের প্রকৃত বাস্তব স্বরূপ নির্ণয়ের ও পূর্ণ সত্যের উপলব্ধির প্রচেষ্টায় চেতনার কোন স্থান নেই। জড়কণিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট শক্তিকণিকা বা শক্তি তরঙ্গ নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে, বিশেষতঃ সাংখ্য ও বেদান্তে বিশ্বের বাস্তব স্বরূপ ও সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে যে অপূর্ব সুসংগত ও সারগর্ভ প্রকল্প আছে তাতে এক সর্বব্যাপী চেতনা শক্তি বিশ্বের আদি ও মূল কারণ বা তার বাস্তব স্বরূপ হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। এই বিশ্ব চেতনারই অন্য নাম সামগ্রিক জ্ঞান।, নিরাপেক্ষিক বা অখণ্ড সত্য। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ রূপম্ অমৃতং যৎ বিভাতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তার আদি নাই, অন্ত নাই। ব্রহ্মকে জানলেই তাই আর কিছু জানবার বাকি থাকে না। এই জ্ঞানস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম পরম আনন্দের আধার। আগেই বলা হয়েছে, সামগ্রিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্যও নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও বুদ্ধির একটি সীমা আছে। অসীমের বা অনন্তের রাজ্যে এদের দৃষ্টি চলে না। তাই আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বের বাস্তব স্বরূপ বা ব্রহ্মকে বলা হয়েছে অবাঙমনসোগোচরঃ। কিন্তু স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার (intuition)মাধ্যমে মানুষ এই ব্রহ্মের বা সামগ্রিক জ্ঞানের আভা পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'আমি আছি' অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব, এই সত্যটি মানুষমাত্রই বিনা তর্কে পরীক্ষা বা প্রমাণে মেনে নেয়। সেরূপ বিশ্বজগতের অস্তিত্বও একটি সার্বভৌমিক সত্য বা বিশ্বাস। শাস্ত্রে আছে যোগীপুরুষেরা তাদের সমাধি অবস্থায় এই সামগ্রিক জ্ঞান বা ব্রহ্মের রসাস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞাকে পরমাত্মা ও জগতের মধ্যে বা বিশ্বের বাস্তব স্বরূপ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধমূলক জ্ঞান বলা হয়। তাই একে অনেকে বিশ্বাত্মার বানী বা ভগবতবানী বলে অভিহিত করেন। মহাত্মা গান্ধী একে "inner voice" (অন্তর দেবতার বানী) বলতেন । জার্মান দার্শনিক কান্টের "Categorical imperative" (নিরাপেক্ষিক অপরিহার্য আদেশ)কে এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অনুসরণ করে দেশকালের পটভূমিতে আমরা জাগতিক বিষয় বৈচিত্রে ও জাগতিক ব্যাপার বা ঘটনা পরম্পরায় জ্ঞানের উপলব্ধি করি; আমাদের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে আমরা জ্ঞাতা বা মানুষের মনকে জানতে পারি; কিন্তু স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার অনুসরণ করে আমরা বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার

DO NOT COPY

অথবা বিশ্বের বাস্তব স্বরূপ বা সামগ্রিক জ্ঞান ও অখণ্ড সত্যের আভা পেতে পারি। সুতরাং বলা যায় যে আমাদের সীমাত্মক বুদ্ধির গড়া বিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করে সামগ্রিক জ্ঞান বা নিরাপেক্ষিক সত্য অথবা বাস্তবের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞার মাধ্যমে ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা, যার উদ্বোধনের জন্য প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ও ভগবদগীতায় ত্রিবিধ পন্থার ব্যবস্থা ও সুন্দর বর্ণনা আছে। এ সব পন্থা যথাক্রমে (১) জ্ঞানযোগ (পরাজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন), (২) কর্মযোগ (সর্বভূতের মঙ্গলের জন্য নিষ্কাম কর্ম), (৩) ভক্তিযোগ(সামগ্রিক জ্ঞান বা নিরাপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা)। জ্ঞানকে ভাবে যখন পরিপাক করা হয়, তখন আমাদের কর্ম করবার ইচ্ছার উদ্রেক হয় এবং নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধার অভাবে জ্ঞানলাভ বা কর্ম ফলদায়ক হতে পারে না। ইহাই হল তিনটি বিভিন্ন যোগের মূলতত্ব।

যাঁরা এই তিনটি পন্থার অনুশীলন করেন আমাদের শাস্ত্রে তাঁদের বলা হয়েছে যোগীপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পরমযোগী। তিনি একাধারে ছিলেন জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত। সুতরাং বলা যায়, সামগ্রিক জ্ঞান এবং নিরাপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বা গীতার ভাষায় তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেছিলেন। আজ তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।

❀❀❀

"শিক্ষার মূল কথাটি কি? মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসংবিৎ, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষা-দীক্ষার কার্য।"

--দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

নাথপন্থী গোরখনাথ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে একজন শক্তিধর সাধক ও শ্রেষ্ঠ যোগীরূপে সুপরিচিত।

রাজা ভর্তৃহরি ছিলেন এই মহাযোগী গোরখনাথের শিষ্য। একবার রাজা ভর্তৃহরি তাঁর লোকজন নিয়ে মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন এক বিরাট সরোবরের তীরে। সেখানে চরে বেড়াচ্ছিল বেশ সুন্দর সুন্দর কতকগুলি হরিণ। তাই দেখে রাজার মনে আনন্দ আর ধরেনা। তিনি ভাবলেন, যাক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এলাম, সে উদ্দেশ্য আজ সিদ্ধ হয়েছে। তিনি তখন আনন্দিত মনে তীর-ধনুক নিয়ে একের পর এক তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন এক একটি হরিণকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন বাণ কোন হরিণের গায়ে বিদ্ধ হলো না। তাদের গায়ের পাশ দিয়ে চলে গিয়ে বনের মধ্যে পড়তে লাগলো।

ঐ ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করে হতাশ হলেন রাজা ভর্তৃহরি। তিনি বিষণ্ণমনে একাকী বসে ভাবতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় এক হরিণী তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলতে লাগলো, মহারাজ, এই বনে হরিণেরা কারুর অনিষ্ট করেনি। সুতরাং তাদের কেন হত্যা করতে চান? আর যদি কোন হরিণ মেরে আনন্দ পেতে চান, তাহলে আমাকে আগে মারুন। তবে একটা শর্ত আছে। আমাকে মারার পর আপনাকে কিন্তু শিকার শেষ করতে হবে। এই দলের মধ্যে আমিই একমাত্র হরিণী। আমি আপনার কাছে এসেছি এই কারণে যাতে অন্য সব হরিণেরা বাঁচতে পারে। সুতরাং আমাকে হত্যা করে আপনি আপনার মৃগয়া সফল করুন।

হরিণীর কথা শুনে বিচলিত হলেন রাজা ভর্তৃহরি। দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, ওগো কি করে তা সম্ভব হবে? আমি যে ক্ষত্রিয় সন্তান। আমি যে জেনে শুনে স্ত্রী-অঙ্গে শরাঘাত করতে পারিনা।

রাজার কথা শুনে হরিণী বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল বনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে সে বেরিয়ে এলো বনের মধ্যে থেকে। সঙ্গে একটি তরুণ হরিণ। রাজা ভর্তৃহরির সামনে এসে হরিণীটি বলল, মহারাজ, এ হরিণটি হচ্ছে আমার স্বামী। আপনি একে অনায়াসে বধ করতে পারেন। তবে শর্ত থাকবে আগের

DO NOT COPY

মতন। আপনি একে বধ করার পর আর কোন হরিণের গায়ে শরাঘাত করতে পারবেন না।

রাজা ভর্তৃহরি তখন তীর-ধনুক নিয়ে তৈরি হলেন ঐ তরুন হরিণটিকে বধ করার জন্য। মুহূর্ত মধ্যে তাঁর শরাঘাত এসে লাগলো তরুণ হরিণের শরীরে। সে তখুনি মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে অসম্ভব মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো। তার মধ্যে থেকে বলতে লাগলো তার শেষ বাসনার কথা – মহারাজ, আমি মরলোক ছেড়ে চললাম। আপনি দয়া করে আমার শরীরের কয়েকটি অংশ নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণীর লোককে দান করবেন। আমার পায়ের ক্ষুর দুটি দান করবেন নগরের কোন চোরকে। এর ছোঁয়া লেগে তার পালাবার গতি দ্রুত হবে এবং পায়ের জোরও বাড়বে। আমার শিঙদুটো দেবেন কোন যোগীকে। তিনি যেন এই দুটোকে তাঁর শিঙারূপে ব্যবহার করতে পারেন। আর আমার চামড়াটা দেবেন কোন তপস্বীকে। তিনি যেন এর উপর বসে ঠিকমত ধ্যানজপ করতে পারেন। আমার চোখদুটো যদি কোন রূপসী লাভ করে সে হবে মৃগনয়না। আর আমার মাংসটুকু রাখবেন আপনার জন্য। কোন ভাল পাচককে দিয়ে রান্না করিয়ে আনন্দে ভোজন করতে পারবেন।

হরিণের মুখে এমনতর কথা শুনে অবাক হলেন রাজা ভর্তৃহরি। ভাবলেন, বনের পশুর মুখে এমনধারা ধর্মভাবের কথা তো শোনা যায় না। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন যোগী পুরুষ আছেন। তিনি এই হরিণের মাধ্যমে তাঁর যোগ-বিভূতি প্রকাশ করছেন।

রাজা তখন বিষন্নমনে ফিরলেন প্রাসাদে। হরিণ যেমন পড়ে ছিল তেমনই রইল। প্রাসাদে এসে রাজা ভর্তৃহরি একান্তভাবে ভাবছেন। সেই সময় তিনি দেখা পেলেন যোগী গোরখনাথের। গোরখনাথ রাজাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, বৎস, আজ মৃগয়ায় গিয়ে তুমি যাকে মেরেছ সে সাধারণ হরিণ নয়। সে আগের জন্মে ছিল আমার শিষ্য। শাপভ্রষ্ট হয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে সে হরিণের জীবন যাপন করছে। যোগী গোরখনাথের কথা শুনে রাজা বললেন, প্রভু, তাহলে আপনি কেন আমাকে পরীক্ষা করছেন? আপনি আশ্রিতকে কৃপা করে প্রাণ দান করুন, আর আমিও রেহাই পাই মানসিক তীব্র অনুশোচনার হাত হতে।

রাজার সকাতর প্রার্থনা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না যোগী গোরখনাথ। তিনি মরা হরিণের গায়ে মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করলেন। হরিণ বেঁচে গেল। রাজা ভর্তৃহরি আশ্চর্য বধ করলেন যোগী গোরখনাথের অলৌকিক বিভুতির পরিচয় পেয়ে। যোগীরাজ তখন রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, এই হরিণের প্রারব্ধ কর্ম শেষ হয়েছে। তাই একে বাঁচানো হলেও ধরে রাখবার উপায় নেই। যোগীবরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তার মরদেহ মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

গোরখনাথ রাজাকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় বললেন, মহারাজ, আপনার যদি অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতো আর থাকতো দিব্যচক্ষু, তাহলে বুঝতে পারতেন এই হরিণের আয়ু আজ কোথায় গেল। সে যাচ্ছে শিবলোকে।

* * *

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে রাজা ভর্তৃহরি গেলেন মৃগয়ায়। গভীর বনে প্রবেশ করলেন। এক জায়গায় দেখতে পেলেন চিতাশয্যা। নিম্নশ্রেণীর একদল লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে চিতার সামনে। রাজা ভর্তৃহরি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন চিতার দিকে। জানতে চাইলেন আসল ঘটনাটি। প্রশ্ন করে রাজা ভর্তৃহরি জানতে পারলেন পারবি জাতীয় একটি লোক বনে শিকার করতে এসে সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। তার স্ত্রী পতির সহমরণে যাবে বলে এই চিতাটি সাজানো হয়েছে। চিতায় আগুন দেবার সঙ্গে সঙ্গে পতি পত্নীর নশ্বর মরদেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

রাজা ভর্তৃহরির মনে এই ঘটনাটি বেশ দাগ কাটল। তিনি প্রাসাদে ফেরার পর রাণী পিঙ্গলার কাছে সমস্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করে বললেন, প্রিয়ে, দেখেছ নীচ জাতির নারীর স্বামীর প্রতি কি গভীর ভালবাসা! নির্বিকার চিত্তে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিলে!

স্বামীর কথা শুনে পিঙ্গলা বললো, তবে তুমিও জেনে রেখো তুমি মারা গেলে এমনিভাবে আমিও তোমার চিতায় আত্মবিসর্জন দেবো। তখন সকলে জানতে পারবে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কত গভীর। আরও শোনো, তোমার মৃতদেহ না দেখতে পেলেও কোন ক্ষতি নেই। কেবল তোমার মৃত্যু

DO NOT COPY

সংবাদটা একবার পেলেই সব হয়ে যাবে। তক্ষুনি আমি চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেবো।

রাণীর কথা শুনে সামান্য হাসলেন রাজা। তিনি বললেন, যাক, আমি এখন মরছি না। সুতরাং তুমি তোমার মৃত্যুচিন্তা হতে এখন বিরত হতে পারো।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রাজা ভর্তৃহরি গেলেন শিকারে। সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সেদিনকার কথা। তিনি ভাবলেন, রাণীর সঙ্গে একটা রসিকতা করা যাক। প্রাসাদে খবর পাঠিয়ে দিই, শিকারের সময় মহারাজ হিংস্র বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। দেখি এতে করে পিঙ্গলার মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়। তারপর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাণীর সাথে আমোদ আহ্লাদ করা যাবে।

মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের কুফল ফললো সঙ্গে সঙ্গে। রাজার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র রাণী পিঙ্গলা চিতা সাজালেন। পরে সেই চিতায় অগ্নি সংযোগ করে নিজে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখতে দেখতে তার নশ্বর দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

রাজার কানে ঐ দুঃসংবাদ পৌঁছান মাত্র তিনি শোকে অধীর হলেন। ভাবলেন, হায়! আমি কি নির্বোধ! কেন স্ত্রীর সঙ্গে এমনিধারা রসিকতা করতে গেলাম! সেই জন্যই তো এমন অনর্থ ঘটে গেলো। রাজা দ্রুত পায়ে চলে এলেন স্ত্রীর চিতার পাশে। আকুল ভাবে কাঁদতে লাগলেন। স্ত্রী বিরহের দারুন শোক গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠল।

একসময় রাজার মনে এলো নির্বেদ। তিনি মৃত স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আপন মনে বলতে লাগলেন, প্রিয়ে পিঙ্গলা, তোমার এই মৃত্যু ঘটল আমারই নির্বুদ্ধিতায়। তাই এবার রাজসুখ ও সংসারসুখ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করবো সন্ন্যাসীর ধর্ম।

এমনিভাবে শোকসন্তপ্ত রাজা ভর্তৃহরির মনে এলো বৈরাগ্য। তিনি পত্নীর চিতার পাশে বিমর্ষ ভাবে বসে আছেন। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মহাযোগী গোরখনাথ। তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহারাজ ভর্তৃহরি, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মানুষ। আপনি শোকের ভারে এমন অধীর হচ্ছেন কেন? শোক সম্বরন করুন। রাজা এবার কিছুটা শান্ত হয়ে মহাযোগীর চরণ বন্দনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

মহাযোগীর হাতে ছিল একটি ছোট মাটির পাত্র। তাতে ছিল নর্মদার পবিত্র জল। মহাযোগী রাজাকে ঐ পাত্র দেখিয়ে বললেন, মহারাজ, এতে রয়েছে নর্মদার পবিত্র জল। আপনি এই জল গ্রহণ করে শান্ত হন। মহাযোগীর এই কথা কটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গুর পাত্রটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। তাই লক্ষ্য করে গোরখনাথ শিশুর মত আকুল হয়ে ক্রন্দন শুরু করে দিলেন।

ঐ দৃশ্য দেখে বিস্ময় বোধ করলেন মহারাজা। ভাবলেন, গোরখ নাথ একজন মহাযোগী। তিনি জিতেন্দ্রিয়। সাংসারিক মায়া-বন্ধন তাঁর নির্মল চিত্তে এতটুকু দাগ ধরাতে অসমর্থ। অথচ তিনি সামান্য মাটির একটা পাত্র ভেঙ্গে গেছে দেখে এমন শিশুর মত আকুলভাবে কান্নাকাটি করছেন কেন? এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার!

তিনি অতঃপর যোগীবরকে শান্ত করে বলতে লাগলেন, যোগীবর, আপনি শান্ত হন। আমি এখুনি আপনার জন্যে এরকম পাত্র দশ-বিশটা আনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু প্রভু, আমি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করছি, এই সামান্য জিনিসটার জন্যে আপনি এমন উতলা হচ্ছেন কেন?

উত্তরে যোগীরাজ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, কেন মহারাজ রাণী পিঙ্গলার জন্যে এত উতলা হয়েছেন?

যোগীবরের কথা শুনে বিস্ময় ও উদ্বেগভরা কন্ঠে বললেন মহারাজ, সেকি, সে যে আমার স্ত্রী, এই রাজ্যের রাণী! যোগীবর তেমনই ধীরে ও গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার স্ত্রীই হন আর রাণীই হন, আমার এই মাটির পাত্রের মত সেটা একটা আধার বৈ তো আর কিছু নয়। তা যেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনই আবার আবার গড়াও যায় নতুন করে। আপনি তো আমাকে দশ-

DO NOT COPY

বিশটা মাটির পাত্র যোগাড় করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আমিও তেমনই আপনাকে পঁচিশটা রাণী যোগাড় করে দেবো। তারা প্রত্যেকেই রাণী পিঙ্গলার মত। এই বলে যোগীবর মন্ত্রপূত জল ছড়িয়ে দিলেন চিতার উপর।

দেখতে দেখতে রাজার সামনে দেখা গেলো এক অলৌকিক দৃশ্য। পঁচিশটি পিঙ্গলার মত সুন্দরী নারী এসে দাঁড়ালেন রাজা ভর্তৃহরির সামনে। রাজা তখন মুস্কিলে পড়লেন। এতগুলি সুন্দরী নারীর মধ্যে কোনটি তাঁর পত্নী পিঙ্গলা তা বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি তখন মহাযোগীর কাছে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, যোগীবর, আপনার অসম্ভব যোগশক্তির উপর আমার আস্থা আছে। আপনার শক্তিকে আমি অশ্রদ্ধা করছি না। তবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে আমার পত্নী পিঙ্গলাকে আমার কাছে এনে দিন। আমি এতগুলো রমণীদের মধ্যে থেকে আমার স্ত্রীকে চিনে নিতে পারছি না। কারণ এদের সকলকে দেখতে ঠিক আমার পিঙ্গলারই মত।

রাজার কাতর আবেদনে যোগীবরের হৃদয় মন করুণার রসে আর্দ্র হয়ে গেলো। তিনি তক্ষুণি তাঁর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন উপস্থিত সুন্দরী নারীদের অঙ্গে। দেখতে দেখতে একটি নারী ছাড়া আর সব নারী অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবার যোগীবর রাজার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, মহারাজ, এবার চেয়ে দেখুন আপনার সত্যিকারের রাণীকে। উপস্থিত জনতা যোগীবরের অলৌকিক কর্ম লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করলো।

রাণী পিঙ্গলা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রাজা ভর্তৃহরি এবং যোগীবর গোরখনাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। এবার যোগীবর রাজাকে বিনয় সহকারে বলতে লাগলেন, মহারাজ, এবার আপনার রাণীকে নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে চলুন।

রাজাও যোগীবরের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। রাণী পিঙ্গলাকে নিয়ে ফিরে এলেন প্রাসাদে। শুরু হল তাঁর আগেকার আনন্দময় জীবনলীলা।

দুই রূপে তুমি বর্ষা

শ্রী অক্ষয় মুখার্জী

এই নির্জনে বাতায়নতীরে,
জলকাদামাখা উদাস দুপুরে,
তুমি আছো তবু নাই যেন হেথা,
অট্টালিকার ভীড়ে।
স্মৃতিপটে আঁকা সেদিনের দেখা,
মনোবীণা সাধে তোমার কবিতা,
তোমারই পরশে আঁখিপাতা মোর,
ভিজিতেছে নীরে ধীরে।।

হয়তো কোথাও বাজিছো আজিকে,
নব নব শত সুরে,
মেলিয়া দিয়াছো তোমার আঁচল,
দূর হতে বহু দূরে।
কত শত প্রেম পুঞ্জিয়া বুকে,
আনিয়া দিতেছো হাসি কত মুখে,
হয়তো এখনো আছড়ে পড়িছো,
আমার উঠান জুড়ে।।

ধ্বনিছো হেথায় কতো কবিতায়,
নাট্য গীতের সুরে,
তুলির আদরে, মেঘমল্লারে,
বাদ্যের ঝঙ্কারে।
কিনিয়া নিয়াছে শহরবাসী,
নিক্কন আর তোমার হাসি,
ছবি হয়ে তুমি কাঁদিছ নিঠুর,
বাস্তুকারের ঘরে।।

নিঝুম নিশীথে প্রেয়সীর সনে,
বাতায়ন পাশে বসি,

DO NOT COPY

হেরিনা তোমায় ওগো অপরূপা,
এই শহরেতে আসি।
ঝরিয়া যেথায় তুমি নবধারা,
হরিৎ করেছো বসুন্ধরা,
আনিছো সেথায় কত নবরূপে,
কৃষকের মুখে হাসি।।

নিশীথ রাত্রে বনপ্রান্তরে,
শান্ত দিঘিতে সুনীল সাগরে,
হরিৎক্ষেত্র দুলাইয়া ধীরে,
অঝোর ধারায় পড়িতেছো ঝরে।
অসহায় হেথা তুমি অপরূপ,
তাইতো আজিকে তোমার স্বরূপ,
স্মৃতিপটে আমি খুঁজিয়া বেড়াই,
সারাটি দুপুর ধরে।।

যদি তুমি চাও

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

আমার গানের সুরগুলি বেড়ায় হেসে খেলে
সিন্ধুসম ঢেউ তুলে দোলে তোমার চরণতলে ।
আরতির ধূপশিখা দেখো কেমন স্বর্গপানে ধায়
দীপশিখাটি সেই স্রোতে কেমন নিজেকে বিলায়।
হিয়ার মাঝে বাজাও যদি তোমার কৃপার বাঁশী
রজনীগন্ধা ভরিয়ে দেবে তার মিষ্টি মধুর হাসি।
আমার সুরের সৌরভ ছড়িয়ে দেবে তব গৌরব
তোমার আমার মিলনবেলার সেই আবির্ভাব,
জগতের অলি গলি জলে স্থলে
গানের দিব্যসুরে খুশীর অশ্রুজলে।

আবার কুরুক্ষেত্র

সুনন্দন ঘোষ

নীতির ওড়নায় ক্লীবতা আশ্রয় নেয় গাণ্ডীবে,
হোমাগ্নি-সম্ভূতা নারী দগ্ধ হয় দুঃশাসিত কামে,
তারপর মুক্ত-কেশে বনবাস, অজ্ঞাতবাস, কুরুক্ষেত্র!

হাজার বছর পরেও কক্ষপথ বদলায়নি বিবস্বান,
আমাদের বাহুতে আজও ক্লীবতার কবচ।
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে গেলে
আমরা মাথা হেঁট করেই থাকি।

এর চেয়ে ফিরে আসুক কুরুক্ষেত্র।
শেষ হোক তন্ত্রের ভণ্ডামি,
শেষ হোক শক্তির শাসন।

নাভি থেকে শব্দ উঠে আসে,
স্পর্শ করে কুলকুণ্ডলিনী
সব শব্দ সত্য হয়ে যায়।

সেই সত্য রূপ নিক আজ
গান্ধারীর অভিশাপে, সীতার দীর্ঘশ্বাসে।

DO NOT COPY